যুক্তিগ্রাহ্য আন্দোলন চলছে। কিন্তু সেই প্রতিবাদে বাংলার অর্থনীতি যে অসাধারণত্বের সঙ্গে মিশে গেল তা অভূতপূর্ব! বাজেট শুনে মনে হল রাজ্যের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি একেবারে অন্যমাত্রায় পৌঁছে গেছে। সত্যিই এরকম হলে সারা দেশ থেকে লক্ষ কোটি মানুষ আমাদের রাজ্যে ছুটে আসবে কাজের খোঁজে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার পর তাই আর কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। সারা দেশ এই বাজেটকে টুকে দিলেই হল, জিডিপি বৃদ্ধির হার এক ধাক্কায় পাঁচ থেকে দশ শতাংশে পৌঁছে যাবে। কেন্দ্রীয় বাজেট আমাদের দেশের, আর রাজ্যেরটা একেবারে প্রথম বিশ্বের কোনও দেশ থেকে তুলে আনা। প্রায় সবেতেই বাংলা এক নম্বরে, কৃষিতে বরাদ্দ বেড়েছে দশগুণ, উচ্চশিক্ষায় কুড়ি। হাসির আলোয় শতাংশ নয়, এসব একেবারে মাল্টিপ্লিকেটিং ফ্যাক্টর। কেন্দ্রীয় বাজেট দেখে যে-হতাশা, তা এক লহমায় মিলিয়ে গেল রাজ্য বাজেটের উৎকর্ষে। কোন বাজেটটায় বেশি হাততালি দেবেন তা নিয়ে আর সন্দেহ আছে কি? দেশের গায়ে মোটা কাপড়, পরিষ্কার মালুম হয়। কিন্তু রাজবস্ত্রের মতোই পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন অতিশয় সূক্ষ্ম, তাই আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না, পুরোটাই অনুভব করতে হচ্ছে।

শুভময় মৈত্র

বা জে ট ২

বাজেট ২০২০-২১

অর্থমন্ত্রীর বিপুল বক্তব্য কিন্তু তাও অব্যক্ত অনেক কিছু। যদিও কিছু নতুন দিক দেখা গেল এই বাজেটে।

গত পয়লা ফেব্রুয়ারি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন সংসদে ২০২০-২১ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করেছেন। দু'ঘণ্টা একচল্লিশ মিনিটের বাজেট-ভাষণে বিত্তমন্ত্রী তাঁর বাজেটকে 'Aspirational India, Economic Development, A Caring Society' রূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষণে কখনও উল্লিখিত হয়েছে কাশ্মীরি কবিতার পঙ্‌ক্তি, কখনও বা তামিল বি থিরুভাল্লুভার রচিত শ্লোক। সংস্কৃত এবং ফরাসি কাব্যও উপেক্ষিত হয়নি! কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট একটি অর্থবর্ষে সরকারের আর্থিক প্রতিবেদন। বাস্তবিক অর্থে এটি আয় এবং ব্যয়ের হিসেবেনিকেশ। ভারতীয় সংবিধানের ১১২ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে এই হিসেবের নথিপত্র পেশ করতে বাধ্য। ২০২০-২১ অর্থবর্ষের বাজেট আলোচনার আগে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। একথা সর্বজনবিদিত যে, বিগত কয়েক বছর যাবৎ অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার অনেকটা কমে এসেছে। আর্থিক বৃদ্ধির হার এই মুহূর্তে বার্ষিক পাঁচ শতাংশ হারে এগোচ্ছে। এর নেপথ্য কারণ বহুবিধ। কিছু আন্তর্জাতিক সমস্যা যেমন আছে (চিন-আমেরিকা বাণিজ্যিক সংঘাত), তেমনই অভ্যন্তরীণ সমস্যাও বিদ্যমান। সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিমুদ্রাকরণের মতো ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে। এমনিতে দেশের সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োগের হার আশাপ্রদ নয়। উপরন্তু এর সঙ্গে সাম্প্রতিক অতীতে যোগ হয়েছে অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যাপক সমস্যা, যার কারণ মূলত বিমুদ্রাকরণের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি। অর্থনীতিবিদদের একাংশ মনে করেছিলেন, স্বাভাবিকভাবে সরকারের ব্যয়ের ধরনের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হবে নিয়োগ সমস্যা নিয়ে। বিগত কয়েক মাস যাবৎ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্মকর্তারা ভেবেছেন, শুধুমাত্র সুদের হার কমিয়ে দিলে অর্থনীতিতে গতি আসবে। অথচ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, ক্রম-উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশে মুদ্রানীতির কার্যকারিতা নিয়ে। যে-সমস্যা-র সমাধান এখনও হয়নি। আর এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন স্বল্পসঞ্চয় প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছেন যাঁরা, তাঁরা। কেননা তাঁদের আয় কমেছে। স্বল্প সঞ্চয়ের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান ওপরের দিকে। অনেকেই এই সুদের আয় থেকেই তাঁদের জীবননির্বাহ করে থাকেন। দুঃখের বিষয়, মোদী সরকারের অর্থমন্ত্রীর এসব নিয়ে ভাবার সময় নেই। বরং অর্থমন্ত্রী এবং তাঁর পরামর্শদাতা এবং মন্ত্রকের কর্মকর্তাগণ বাস্তবহীন তথাকথিত 'নব্য ধারণাসমূহ' নিয়ে ভাবতে অধিক স্বচ্ছন্দ এবং ব্যস্ত।

দু'হাজার কুড়ি-একুশ অর্থবর্ষে সরকারের প্রস্তাবিত আয় এবং ব্যয়ের ছবিটি ঠিক কেমন, তা একবার বোঝার চেষ্টা করা যাক। আগামী অর্থবর্ষে আয়ের প্রাপ্তি দেখানো হয়েছে ২২.৪৬ লক্ষ কোটি টাকা। ব্যয়ের হিসেব দেখানো হয়েছে ৩০.৪২ লক্ষ কোটি টাকা। এই অসামঞ্জস্য দূর করা হবে বাজার থেকে ধার এবং কিছু কিছু সরকারি ক্ষেত্র বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে। যার মধ্যে রয়েছে জীবনবিমা নিগম এবং এয়ার ইন্ডিয়া। সরকারের বক্তব্য, রাজকোষ ঘাটতি নাকি ৩.৮% থেকে ৩.৫% নেমে আসবে প্রস্তাবিত অর্থবর্ষে। অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অবশ্য এই রাজকোষ ঘাটতি নিয়ে বহুদিনের দ্বন্দ্ব। এ কথা সম্ভবত দেশের অর্থনৈতিক নীতির নির্ধারকগণ বোঝেন না যে, আসলে কোথায় ব্যয় করা হচ্ছে? ব্যয়ের দু'টি ধরন আছে। এক, উৎপাদনক্ষম ক্ষেত্র এবং দুই, অনুৎপাদন ক্ষেত্র। প্রস্তাবিত বাজেটে ব্যয়ের হিসেবে অনেক প্রস্তাবনা আছে। কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ কোথায় এবং কীভাবে সম্ভব? অনেক অর্থনীতিবিদ বলছেন, নীতি আয়োগের কর্মকর্তারা 'ধারণা' দিতে চিরকালই বিশেষ পারদর্শী। বাস্তবায়নে ঠিক ততটাই অপারগ! ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি এবং কৃষিক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। এই বাজেটে কৃষিক্ষেত্রে ব্যয়ের প্রস্তাব রয়েছে ১,৩৮,০০০ কোটি টাকা (প্রায় ১৯ বিলিয়ন ডলারের মতো)। গ্রামীণ উন্নয়ন ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ১,২৩,০০০ কোটি টাকা (প্রায় ১৭ বিলিয়ন ডলার)। এই সঙ্গে রয়েছে অর্থমন্ত্রীর ১৬ পয়েন্ট এজেন্ডা বা আলোচ্যসূচি।

নরেন্দ্র মোদী সরকারের দাবি, এ থেকে দু'টি ক্ষেত্র এবং 'নীল অর্থনীতি'র (Blue Economy) সমৃদ্ধি হতে পারে। নীল অর্থনীতি ব্যাপারটা কী? নীল অর্থনীতি আদতে পুনর্নবীকরণ শক্তি, মৎস্য উৎপাদন, সমুদ্রপথ পরিবহণ, পর্যটন, আবহাওয়া পরিবর্তন এবং বর্জ্যবস্তু সংক্রান্ত ম্যানেজমেন্ট। বাজেটে এ সবের মিশ্রণের কথা বলা হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর ষোলো পয়েন্টের আলোচ্যসূচিতে রয়েছে দেশকে আর্থিক দিক থেকে শক্তিশালী করা, যুবসম্প্রদায়কে মৎস্যখাতে উৎসাহী করে তোলা, কৃষি উড়ান স্কিম, স্টোরেজের ব্যবস্থা, চুক্তিভিত্তিক কৃষি বা কনট্রাক্ট ফার্মিং অ্যাক্ট ২০১৮ এবং ল্যান্ড লিজিং অ্যাক্ট ২০১৬-এর বাস্তবায়ন। এই সঙ্গে রয়েছে কৃষকদের দু'টি প্রধান সমস্যা যেমন, উৎপাদনের দিক থেকে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ এবং উৎপাদিত পণ্যের দিক থেকে ফরোয়ার্ড লিঙ্কেজ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ধারণা তো দেওয়া গেল কিন্তু এর বাস্তবায়ন নিয়ে দেশের সমস্ত নীতি-দলিল নীরব। সরকার কি ভেবেছেন কখনও যে, গ্রামে আর-এক ধরনের জনগোষ্ঠী রয়েছেন, যাঁরা অসংগঠিত ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাঁদের নিয়ে তো কারও মাথাব্যথা নেই। অথচ অনেক কিছুই ঘটে যাচ্ছে বিভিন্ন গ্রামে এবং প্রায়শই বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারের কোনও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ব্যতীত।

বিষয়টা একটু উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরা যাক, সুন্দরবনের মধু, শান্তিপুরের শাড়ি কিংবা জয়নগরের মোয়া নিয়ে।

সাধারণ ব্যবসায়ী মডেলে মধ্যস্থতাকারীরা এই সব বিক্রীত পণ্য মূল্যের প্রায় পুরোটাই গ্রাস করে ফেলে! উপরন্তু অনেক সময়ই বিক্রীত পণ্যের তাৎক্ষণিক নগদ অর্থ পাওয়া যায় না। এখন এই প্রস্তুতকারীরা যাঁরা কিনা উদ্যোক্তা, ফেসবুক লাইভ, ইনস্টাগ্রাম কিংবা ই-কমার্সের মাধ্যমে তাঁদের প্রস্তুতকৃত পণ্য সরাসরি ভোক্তার কাছে বিক্রি করছেন। এঁদের সঙ্গে এগিয়ে এসেছে ক্ষুদ্র এবং স্বল্প সঞ্চয় বা পুঁজিকে ভরসা জোগায়, এমন কয়েকটি ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে 'বিকাশ' তো এ নিয়ে রীতিমতো বিপ্লব করে ফেলেছে! ভারত সরকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে অত্যন্ত সরব। কিন্তু এ নিয়ে তাদের বিস্তৃত ভাবনার অবকাশ কম। দেশের পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কাজ ও গবেষণা হয় যে-সমস্ত বিভাগে, সেখানেও কেউ এ নিয়ে বিস্তৃত কিছুর সন্ধান করেন না। সেজন্যে অর্থনীতিবিদদের অনেকে 'নিয়োগ' শব্দের সংজ্ঞাও নতুন করে ভাবনার কথা বলছেন।

এই প্রসঙ্গে চিনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। চিনের একটি গ্রামের নাম 'তাওবাও'। এই গ্রামের উন্নতি প্রধানত 'ইনক্লুসিভ গ্রোথ'-এর পথ ধরে। রিটেলের বিখ্যাত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন রকমের সহযোগিতা করতে। চিনের 'তাওবাও' গ্রাম ইনক্লুসিভ গ্রোথের একটি রোল মডেল। তাওবাওয়ের মতো গ্রামের উন্নতিতে দেখা যাচ্ছে ই-কমার্সের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ফিরে আসছি বাজেট প্রসঙ্গে। সরকারের প্রস্তাবিত বাজেটে মধ্যবিত্তরা হয়তো তেমন অসন্তুষ্ট হবেন না। আয়কর প্রসঙ্গে বলি। এখানে বার্ষিক আয় অনুযায়ী আয়কর প্রদানকারীদের সাতটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। একজন আয়কর প্রদানকারী দু'টি পদ্ধতির যে-কোনও একটি বেছে নিতে পারেন। যাঁরা বিভিন্ন অব্যাহতির (deduction) সুযোগ নিচ্ছেন, তাঁরা বর্তমান পদ্ধতিতে উপকৃত হবেন। যেসব করদাতা এসবের সুযোগ নিতে পারেন না, তাঁরা নতুন পদ্ধতিতে উপকৃত হবেন। হিসেবটিও বেশ জটিল। অনেক অর্থনীতিবিদ বলছেন, সুবিধেটি 'কসমেটিক'। এঁদের মতে, আয়করদাতাদের এই সমস্ত বিভাগ মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করলে ফলাফল অন্য রকম হতে পারে।

কিছু কিছু নতুন দিক অবশ্য দেখা গেল বর্তমান বাজেটে। মেক ইন ইন্ডিয়ার ছবি রেখে কাস্টমস ডিউটি কিছু কিছু পণ্যে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখানে একটা অনিবার্য প্রশ্ন এসে পড়ছে, তবে কি আমরা ইমপোর্ট সাবস্টিটিউশনের পথে হাঁটতে চলেছি ভবিষ্যতে? অর্থনীতিবিদদের একাংশের যুক্তি, কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়নের ব্যয় অর্থনীতিতে চাহিদা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। কেননা, এতে নিয়োগ এবং সেই সঙ্গে ভোগব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে। বিনিয়োগকারীরা যদি অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তার কারণে ভীতসন্ত্রস্ত থাকেন, অর্থনীতির তত্ত্ব অনুযায়ী তখন সরকারই এগিয়ে আসবেন, অর্থনীতির গতি ফিরিয়ে আনার তাগিদে। অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে বলেছেন আরও অনেক কিছু, তবে এর মধ্যে অনেক কিছুই অব্যক্ত থেকে গেল একজন সাধারণ নাগরিকের কাছে।

অরিন্দম বণিক

দৃষ্টিকোণ

অবিরল মৃত্যুতরঙ্গ

বিজ্ঞানীরা মনে করছেন আজ ঘন ঘন যত প্যানডেমিকের ঢেউ জাগছে, সেগুলো 'তৈরি করছি' আমরাই।

ফেব্রুয়ারির ১৩ তারিখের হিসেব: নয়া করোনাভাইরাস ছড়িয়েছে ৫টা মহাদেশের ২৮টা দেশে, গত ডিসেম্বর থেকে আজ অবধি তা অধিকার করেছে ৬০৩৮০ জন মানুষকে, একজন থেকে ছড়াচ্ছে গড়ে অন্তত ৩ জনের শরীরে। সংক্রমণের পর থেকে রোগের লক্ষণ ফুটে বেরতে দু'সপ্তাহও লাগতে পারে, অর্থাৎ আক্রান্তের শরীর থেকে দীর্ঘদিন তা ছড়াতে পারে, অজান্তেই। জীবাণুটা আক্রমণ করে শ্বাসযন্ত্রকে। ইতিমধ্যে মৃত ১৩৬৯, সংখ্যাটা অনেক বাড়বে, এই মুহূর্তে ৮২১৯ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

আকস্মিক?

একেবারে না। উল্টোটা। পৃথিবী প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু প্রতীক্ষায় ছিল। ছোট ছোট বহু ভূকম্পের ভেতর বসে একটা বড়সড় ধাক্কার জন্য অপেক্ষা করার মতো। এবং এ-ও ঠিক, আজ যে করোনাভাইরাস-ঘটিত নিউমোনিয়াকে নয়া মনে হচ্ছে, কয়েকদিন বাদে তাকে বাসি ও মামুলি প্রমাণ করবে এমনই কোনও ভাইরাস বা অন্যধরনের জীবাণু-সৃষ্ট নতুন রোগ, কে জানে কোন পাখি, কোন বাঁদর, বাদুড় বা শুয়োরের শরীরে তা এখন নিশ্চিন্ত নিদ্রায় আছে। এটা আকস্মিক নয়, অবধারিত। কেন, তার উত্তরটা কিছুটা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে এখনই।

শতাব্দীর পর শতাব্দী নানা মহামারীর তরঙ্গ পেরিয়েছে আজকের মানুষ। আমাদের শরীর, শারীরতত্ত্ব, সাক্ষী আছে অতীতের অজস্র সংক্রমণের, এক অর্থে তারা আমাদের গড়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা মনে করছেন আজ ঘন ঘন যত এপিডেমিক ও প্যানডেমিকের ঢেউ জাগছে, সেগুলো 'তৈরি করছি' আমরাই। কখনও অজান্তে, কখনও গায়ের জোরে সত্যকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে।

এপিডেমিককে যদি মহামারী বলি, প্যানডেমিক তাহলে বিশ্ব-মহামারী— যা কোনও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক গণ্ডিতে আটকে থাকে না। বিস্তীর্ণ এলাকায়, বিভিন্ন মহাদেশে তা ছড়ায়, বহু হাজার, এমনকী বহু লক্ষ ও কোটি মানুষের ঘরে পৌঁছয় তার থাবা। পৃথিবীতে দুটোরই উৎপাত বাড়ছে। তার মূলে গতি ও প্রগতি দুই-ই আছে। আধুনিক মানুষের আনুকূল্যধন্য এইসব রোগ নব নব রূপে জন্ম নিচ্ছে, ছড়াচ্ছে বিদ্যুৎগতিতে।

অতীতের সংক্রমণ ছোট পরিসরে বাঁধা থাকত কারণ আক্রান্ত মানুষের ঘোরাফেরার পরিধি ছিল ছোট। আজ বার্ষিক উড়ানযাত্রীর সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৪০০ কোটি, অন্তর্দেশীয় বা আন্তর্দেশীয় উভয় মিলিয়ে। কোনও জীবাণু এর থেকে ভাল বাহক আর কীভাবে পাবে! তবু, অতীতেও, যেখানে রোগ বয়ে নিয়ে গেছে তুলনায় অধিক সচল কোনও প্রাণী, প্লেগের বেলায়, অন্তত অতীতের দৃষ্টান্তে যেমন— ফ্লি নামক কীট ও ইঁদুর, সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা বাধা মানেনি। চোদ্দো শতকে প্লেগের আক্রমণে মারা যায় প্রায় ৬ কোটিরও বেশি মানুষ। গোটা ইউরোপের জনসংখ্যা অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল চার-পাঁচ বছরের ভেতর, গোটা পৃথিবীর হিসেবে মৃত অন্তত ১৫ কোটি। দু'-দু'টো শতাব্দী পেরিয়ে পৃথিবীর জনসংখ্যা ফের প্লেগ-পূর্ববর্তী মাত্রা ছুঁতে পেরেছে। ১৯১৮-র স্প্যানিশ ফ্লু ৫ কোটিরও বেশি মানুষের প্রাণ নিয়েছে।

অনাগত মহামারীর সম্ভাব্য গতিপ্রকৃতি এবং হননমাত্রা আগাম বোঝা যায় কি না তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে চলেছেন পৃথিবীর বেশ কয়েকটি বিজ্ঞানীদল। বিল গেটস এমন একটি গবেষণা দলের পৃষ্ঠপোষক। বছর তিনেক আগে এক সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁদের অনুসন্ধানের ফল উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, ১৯১৮-র তুলনায় ৫০ গুণ বেশি হারে আমরা দূরান্তে পাড়ি দিচ্ছি, আগামী কোনও সংক্রমণের পক্ষে মাত্র ২০০ দিনে স্প্যানিশ ফ্লুয়ের হননমাত্রা অতিক্রম করে যাওয়া অসম্ভব নয়। অর্থাৎ রোগের প্রতিষেধক খোঁজা বা রুগির শুশ্রূষা যেমন জরুরি, সমান জরুরি